রবীন্দ্রভাবনায় দুর্গা

তুহিন শুভ্র ভট্টাচার্য

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

সূচীপত্র

- সূচনা ১১
- রবীন্দ্রকাব্যে দুর্গা ১৮
- ছোট গল্পে দুর্গা ৩১
- রবীন্দ্র-নাটকে দুর্গা ৩৯
- প্রবন্ধ সাহিত্যে দুর্গা ৪৭
- ব্যঙ্গ কৌতুকে দুর্গা ৬৩
- রবীন্দ্র উপন্যাসে দুর্গা ৬৬
- গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যে দুর্গা ৭৩
- চিঠিপত্রে দুর্গা ৭৬
- শারদীয় সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ ৮৭
- বিজয়া ও রবীন্দ্রনাথ ৯২
- ''আমি আজন্ম ব্রাত্য'' ৯৫
- তথ্যসূত্র ৯৬

মুখবন্ধ

রবীন্দ্রনাথকে "ব্রাহ্ম" আখ্যা দিয়ে তাঁকে একটি ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রেখে এক হাস্যকর অপব্যাখ্যার অপচেষ্টা মাঝে মধ্যেই করা হয়ে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক, অধ্যাপক থেকে সুরু করে তথাকথিত রবীন্দ্র-সমালোচক পর্যন্ত—এই ধরণের এক অসাধু রবীন্দ্র-ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন এবং এর থেকে তাঁদের বেশ অর্থাগমও হচ্ছে। এই অবিবেকী-কৃপমণ্ডুকতা আসলে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে কলঙ্কেরই নামান্তর মাত্র। সৌভাগ্যবশতঃ এই শ্রেণীর স্বঘোষিত সমালোচকদের অন্তঃসারশূন্য বক্তব্যকে পাঠক পাঠিকারা কখনই সাদরে গ্রহণ করেননি।

বেশ কয়েক বছর আগে আমি নিজেও এই ধরনের রবীন্দ্র-দূষণের পরিচয় পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। "আমি আজন্ম ব্রাত্য"—এতো রবীন্দ্রনাথেরই নিজের কথা। অথচ—তাঁকেই কিনা এক সাম্প্রদায়িক বেড়াজালের মধ্যে আটকে রাখার এক হীন প্রচেষ্টা।

একথা ভাবতে ভাবতেই ছিন্নপত্রের একটি চিঠির মধ্যে আমি প্রথম খুঁজে পাই নির্মীয়মান দেবী দুর্গার সামনে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের অনুভূতির কথা ঃ

"........পরশুদিন সু (রেশ) স (মাজপতি) র বাড়ি যাবার সময় দেখছিলুম রাস্তার দুধারে প্রায় বড়ো বড়ো বাড়ির দালান মাত্রেই দুর্গার দশ-হাত-তোলা প্রতিমা তৈরি হচ্ছে এবং আশেপাশের সমস্ত বাড়ির ছেলের দল ভারী চঞ্চল হয়ে উঠেছে। দেখে আমার মনে হল দেশের ছেলেবুড়ো সকলেই হঠাৎ দিনকতকের মতো ছেলেমানুষ হয়ে উঠে সবাই মিলে একটা বড়ো গোছের পুতুল খেলায় প্রবৃত্ত হয়েছে।........এইরকম উৎসবের সময় ভাবস্রোত দেশের অধিকাংশ লোকের মন অধিকার করে নেয়। তখন যেটাকে আমরা দূর থেকে শুষ্ক হৃদয়ে সামান্য পুতুলমাত্র দেখছি, সেইটে কল্পনায় মণ্ডিত হয়ে পুতুল-আকার ত্যাগ করে। তখন তার মধ্যে এমন একটি বৃহৎ ভাবের এবং প্রাণের সঞ্চার হয় যে, দেশের রসিক-অরসিক সকল লোকই তার সেই অমৃতধারায় অভিষিক্ত হয়ে ওঠে। তার পরে আবার পুতুল যখন পুতুল হয়ে আসে তখন সেটাকে জলে ফেলে দেয়। ....অতএব এরকম করে দেখতে গেলে সব জিনিষই পুতুল; কিন্তু হৃদয়ের ভিতর দিয়ে, কল্পনার ভিতর দিয়ে দেখতে গেলে তাদের দেবতা বলে চেনা যায়—তাদের সীমা পাওয়া যায় না। এই কারণে সমস্ত বাংলাদেশের লোক যাকে উপলক্ষ্য করে আনন্দে ভক্তিতে প্লাবিত হয়ে উঠেছে, তাকে আমি মাটির পুতুল বলে যদি দেখি তবে তাতে কেবল আমারই ভাবের অভাব প্রকাশ পায়।"

সেই সুরু। তারপর কয়েকটি বছর ধ'রে চলে আমার এ-বিষয়ে অনুসন্ধানের আনন্দ। যতই খুঁজে ফিরেছি ততই আমার তথ্য সংগ্রহ আরও সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠেছে। দুর্গা সম্পর্কে—রবীন্দ্রনাথের অমূল্য ভাবনাচিন্তাকে আশ্রয় করেই আমার এই সামান্য লেখাটি অবশেষে শেষ

হয়। হয়তো আরো অনেক কিছুই বাকি থেকে গেল। তাই দুর্গা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনার ব্যাপারে আমার অনুসন্ধান শেষ হয়নি। কারণ প্রথম যখন আমি বিষয়টিকে কেন্দ্র ক'রে একটি ছোট আকারের প্রবন্ধ লিখি তখন ভাবতেও পারিনি যে, বিষয়টির গভীরে প্রবেশ ক'রে অনেক মণিমুক্তো খুঁজে পাবো। আমার আশা হয়তো আরো অনেক অনাবিষ্কৃত তথ্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে যেগুলি ভবিষ্যতে কেউ না কেউ পাঠকের গোচরে আনবেন।

গ্রন্থটি যখন পাণ্ডুলিপি আকারে ছিল তখন আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের কেন্দ্র নির্দেশক ডঃ অমিত চক্রবর্তী নিয়মিত খোঁজ নিয়েছেন আমার কাজের অগ্রগতি নিয়ে এবং বহু মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমার প্রচেষ্টাকে নিয়ত প্রেরণা দিয়েছেন। আমি তাঁর কাছে বিশেষভাবে ঋণী এবং শুধুমাত্র কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁকে ছোট করার কোনও অধিকারই আমার নেই।

আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের উপ-অধিকর্তা শ্রীকল্যাণাশীষ দাশগুপ্ত এই গ্রন্থ রচনায় প্রতিটি স্তরে তাঁর সুচিন্তিত মতামত এবং বহু মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমাকে অনেক সমস্যার হাত থেকে উদ্ধার করেছেন। তাঁর কাছেও আমি অশেষ ঋণে ঋণী।

পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার পরে পরিমার্জনের দীর্ঘসূত্রিতাকে কাটিয়ে ওঠার ব্যাপারে বন্ধুবর পীযুষকিরণ রায়ের সতর্ক দৃষ্টির জন্য তিনি আমার ধন্যবাদার্হ।

কুমারী শম্পা ঘোষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার জানা নেই। কেননা তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ''পুনশ্চ'' প্রকাশনা সংস্থার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন এবং আমার পাণ্ডুলিপিটি যাতে যথাশীঘ্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় তার জন্য তাঁর উৎকণ্ঠা আমায় অভিভূত করেছে। তাঁর কাছে আমার ঋণ কোনোদিনই শোধ হবার নয়।

আমার পুত্র পারসিক এবং স্ত্রী দীপ্তি প্রুফ সংশোধনের ব্যাপারে সাহায্য ক'রে আমার কাজকে অনেকটা সহজ ক'রে দেবার জন্য আমি তাদের কাছেও কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে, আজকের দিনে অত্যন্ত ব্যায়সাধ্য গ্রন্থনশিল্পে ''পুনশ্চ''র শ্রীশঙ্করীভূষণ নায়ক এবং সন্দীপ নায়ক প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে যে-ভাবে এককথায় আমার পাণ্ডুলিপি সাদরে গ্রহণ করেছেন তা ভাষায় প্রকাশ করার সাধ্য আমার নেই। তাঁদের এই দুঃসাহস বর্তমান যুগে প্রকাশনা জগতে দুর্লভ। তাঁদের কাছে আমি আজীবন ঋণগ্রস্ত হ'য়ে রইলাম।

আশা করি, পাঠক-পাঠিকা এবং সমালোচকদের কাছে আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সমাদর লাভে বঞ্চিত হবে না।

কলকাতা

তুহিন শুভ্র ভট্টাচার্য

সূচনা

১৯০৩ সালের ২২শে অক্টোবর বোলপুর থেকে কাদম্বিনী দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন, ''সাকার নিরাকার একটা কথার কথামাত্র। ঈশ্বর সাকার এবং নিরাকার দুই-ই। শুধু ঈশ্বর কেন আমরা প্রত্যেকেই সাকারও বটে নিরাকারও বটে। আমি এ সকল মতামত লইয়া বাদ-বিবাদ করিতে চাহি না। তাহাকে রূপে এবং ভাবে, আকারে এবং নিরাকারে, কর্মে এবং প্রেমে সকল রকমেই ভজনা করিতে হইবে। আকার তো আমাদের রচনা নহে, আকার তো তাঁহার-ই।'' আবার ১৯১০ সালের ১৩ই জুলাই আরেকটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ কাদম্বিনী দেবীকে লেখেন, ''আমাদের দেশে প্রচলিত পূজার্চনাবিধির মধ্যে এমন সুগভীর তত্ত্ব আছে যা বহুমূল্য। আমাদের দেশে যাঁরা মহাপুরুষ জন্মেছিলেন আধ্যাত্মিক সাধনায় তাঁরা আশ্চর্য সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।'' এরও দুবছর পরে ১৯১২ সালের ১৮ই মার্চ আরেকটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ কাদম্বিনী দেবীকে লেখেন, ''প্রতিমা সম্বন্ধে আমার মনে কোনো বিরুদ্ধতা নেই। অর্থাৎ যদি কোনো বিশেষ মূর্তির মধ্যেই ঈশ্বরের আবির্ভাবকে বিশেষ সত্য বলে না মনে করা যায় তাহলেই কোনো মুস্কিল থাকে না। তাঁকে বিশেষ কোনো একটি চিহ্নদ্বারা নিজের মনে স্থির করে নিয়ে রাখলে কোনো দোষ আছে একথা আমি মনে করিনে। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোনো মূঢ়তাকে পোষণ করলেই তার বিপদ আছে।'' বস্তুতপক্ষে ধর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উদার মনোভাবের জন্য রবীন্দ্রনাথ নিজেই কাদম্বিনী দেবীকে একবার লিখেছিলেন, ''নানা কারণে ব্রাহ্ম সমাজ আমাকে ঠিক ব্রাহ্ম বলে গ্রহণ করেননি এবং আমাকে তাঁরা বিশেষ অনুকূল দৃষ্টিতে কোনোদিন দেখেননি।'' (চিঠিপত্র, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ২৮)

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের পক্ষে শিলাইদহে আন্তরিকতার সঙ্গে গোপীনাথের সেবা করা এবং মেজদা সত্যেন্দ্রনাথের পুত্র সুরেন্দ্রনাথের মাথায় গোপীনাথের আশীর্বাদ দিয়ে অভিষেক সম্পন্ন করানো ছিল খুবই সহজ কাজ। শচীন্দ্রনাথ অধিকারী তখন শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের জমিদারীতে কর্মরত। সেদিনের স্মৃতি থেকে তিনি লিখেছেন, ''রবীন্দ্রনাথ গোপীনাথ মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতেন জুতো বাইরে রেখে, খালি পায়ে। এল্‌মহার্স্ট সাহেব জুতো ছেড়ে গোপীনাথ মন্দিরের কাজ দেখতেন। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ নববধূসহ শিলাইদহে এসে প্রথমেই গোপীনাথের আশীর্বাদ গ্রহণ করেছিলেন। এ ঘটনা আমরা দেখেছি।'' এমনকি শিলাইদহে থাকাকালীন একটি ঘটনার মধ্যে দিয়েও দুর্গা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার প্রকাশ পাই। শচীন্দ্রনাথ অধিকারী ঘটনাটির বিবরণ দিয়ে লিখেছেন, ''কবি জমিদার মাথা ঘামাচ্ছেন শিলাইদহে খুব প্রকাণ্ড একটা মেলা করতে হবে। ....পাঁজিপুঁথি শাস্ত্রপুরাণ ঘেঁটে কিছু হল না। দারুণ উৎসাহ, দেরি হলে হয়ত জুড়িয়ে যাবে। ভেবে-চিন্তে ঠিক হল 'কাত্যায়নীর' মেলা হবে। মা দুর্গাই কাত্যায়নী।

শীত পড়েছে, কিন্তু মা দুর্গার মতোই প্রতিমা তৈরি হল কাত্যায়নীর। সে যে কী বিরাট বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা, কি বলব!

গোপীনাথ মন্দিরের সামনে 'খোলাচে' প্রকাণ্ড মণ্ডপ তৈরি হল, প্রতিমা তৈরি হল। সময়ের অভাব, তাই রাত্রে—গ্যাসের আলো জ্বালিয়ে গাঁয়ের মুরুব্বি, ছেলে-বুড়ো সবাই খাটছেন। আহার নিদ্রা ভুলে গেছেন। যাত্রা, থিয়েটার, পাঁচালি, কবি, তরজা, কীর্তন, বাউল ইত্যাদির বিরাট আয়োজন সাতদিন ধরে। মেলা দীর্ঘদিন চলবার জন্যে কেউ বললেন, মেলার নাম হোক 'করোনেশন মেলা' (১৯০২ সালে সপ্তম এডওয়ার্ডের 'করোনেশন' উৎসব স্মরণ করে)। রবীন্দ্রনাথের তাতে ঘোর আপত্তিতে নাম হল 'কাত্যায়নী মেলা'। এইভাবে বিরাট মেলা হল পরপর তিন বছর।

তারপর 'কাত্যায়নী মেলা' গেল উঠে; রবীন্দ্রনাথের মাথার মধ্যে ঐ স্বদেশী মেলার নানা কল্পনা তখনও জাল বুনছে। দু-তিন বছর যেতেই আবার তাঁর প্রস্তাব, এবার অন্যখানে অন্য মেলা হবে; এবার হল রাজরাজেশ্বরীর মেলা। তখন ম্যানেজার ছিলেন বিপিন বিশ্বাস, অদ্ভুত মানসিক শক্তিতে শক্তিমান পুরুষ। তিনি একাই একশো। দশমহাবিদ্যার 'ষোড়শী' মূর্তি হল। নতুন করে প্রকাণ্ড পাকা মণ্ডপ তৈরি হল।

মেলা হল পনেরোদিন ব্যাপী। কাত্যায়নী মেলা ও রাজরাজেশ্বরীর মেলা উপলক্ষে রবীন্দ্র-বন্ধু আচার্য জগদীশচন্দ্র ও নাটোররাজ জগদিন্দ্রনাথ এসেছিলেন; কৃষ্ণনগর কুষ্ঠিয়া থেকেও হোমরা-চোমরা হাকিমরা এসেছিলেন।"

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এককালে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে দুর্গাপূজার প্রচলন ছিল, এবং তা হয় নীলমণি ঠাকুরের আমল থেকেই। ১৭৮৪ সালের জুন মাস থেকে নীলমণি ঠাকুর জোড়াসাঁকোয় গোলপাতার ঘর করে বসবাস শুরু করেন। তখন অবশ্য জোড়াসাঁকোর নাম ছিল মেছুয়াবাজার। নীলমণি ঠাকুরের কন্যা কমলমণি গল্প করতেন যে, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির "প্রথম দুর্গাপূজা খোলার ঘরে হয়।" বস্তুতঃ দ্বারকানাথ ঠাকুরের সময় থেকেই জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির পুজোর সমারোহ কিন্তু শুরু হয়। তাঁর আমলে ঠাকুরবাড়িতে দুর্গাপুজো, কালীপুজো, লক্ষ্মীপুজো, জগদ্ধাত্রীপুজো, সরস্বতীপুজো অনুষ্ঠিত হতো। তবে যেহেতু দ্বারকানাথ নিজে ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন, তাই পুজোয় জীববলি হত না। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়, "আমাদের বৈষ্ণব পরিবারে কী ভাগ্যি পশুবলির বীভৎস কাণ্ড ছিল না সেই রক্ষা, — পশুর বদলে কুমড়ো বলি হয় এই শুনতুম।" এ প্রসঙ্গে তখনকার কালের সংবাদপত্রে এই খবরটি প্রকাশিত হয় যে, "শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহিত রামমোহন রায়ের আত্মীয়তা আছে কিন্তু রায়জী তাঁহার নিত্যকর্ম কিছুই রহিত করাইতে পারিয়াছেন তাহা কখনই পারিবেন না। ঐ বাবুর বাটিতে ঁ দুর্গোৎসব, শ্যামাপূজা, ঁ জগদ্ধাত্রী পূজা ইত্যাদি তাবৎ কর্ম হইয়া থাকে।" দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর এক ভাষণে উল্লেখ করেছেন যে, "প্রথম বয়সে উপনয়নের পর প্রতিনিয়ত যখন গৃহেতে শালগ্রাম শিলার অর্চনা দেখিতাম, প্রতি বৎসরে যখন দুর্গাপূজার উৎসবে উৎসাহিত হইতাম তখন মনের এই বিশ্বাস ছিল যে, ঈশ্বরই শালগ্রাম শিলা, ঈশ্বরই দশভুজা দুর্গা, ঈশ্বরই চতুর্ভুজা সিদ্ধেশ্বরী।"

জ্যেষ্ঠপুত্র দেবেন্দ্রনাথ পিতা দ্বারকানাথের প্রতিনিধি হিসেবে বাড়ি বাড়ি গিয়ে দুর্গাপূজার নিমন্ত্রণ করে আসতেন। পরিবারের সর্বজ্যেষ্ঠ রামমণি ঠাকুরের নামে নিমন্ত্রণ পত্রটি রচিত হত। দেবেন্দ্রনাথ একবার রাজা রামমোহন রায়কে নিমন্ত্রণ করতে গিয়েছিলেন। ''রাজা বন্ধুপুত্র দেবেন্দ্রকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন, দেবেন্দ্র তাঁর ছোটছেলের সমবয়সী, তবু রাজার সঙ্গে গড়ে উঠেছিল একটি সহজ প্রীতির সম্পর্ক। তাই দেবেন্দ্রনাথ যখন তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, 'রামমণি ঠাকুরের নিবেদন' তিনদিন আপনার প্রতিমা দর্শনের নিমন্ত্রণ, তখন রাজা বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন, 'বেরাদার। আমাকে কেন?' পরমুহূর্তেই তিনি বুঝতে পারেন এটি একটি সামাজিক ব্যাপার, তিনি যে পৌত্তলিকতার বিরোধী তা বোঝার মতো বয়স তখনও দেবেন্দ্রনাথের হয়নি। তিনি তাঁকে রাধাপ্রসাদের কাছে পাঠালেন। রাধাপ্রসাদ নিমন্ত্রণপত্র গ্রহণ করে দেবেন্দ্রনাথকে মিষ্টিমুখ করিয়েছিলেন। এই ঘটনাটি দেবেন্দ্রনাথকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল।''

ঠাকুরবাড়ির ছোটো ছোটো ছেলেরা প্রতিমা গড়ার সময় থেকেই আনন্দ উপভোগ করতো। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, ''প্রথমে খড়ের কাঠাম, তার উপর মাটি, খড়ের প্রলেপ তার উপর রঙ, ক্রমে চিত্রবিচিত্র খুঁটিনাটি আর আর সমস্ত কার্য; সবশেষে অর্ধচন্দ্রাকৃতি চালের পরে দেবদেবীর মূর্তি আঁকা, তাতে আমাদের চোখের সামনে বৈদিক, পৌরাণিক দেবসভা উদ্‌ঘাটিত হত। ....রাংতা দিয়ে যখন ঠাকুরদের দেহমণ্ডল, বসনভূষণ, সাজসজ্জা প্রস্তুত হত আমাদের দেখতে বড়োই কৌতূহল হত। লক্ষ্মী সরস্বতীর চমৎকার বেশভূষা, লম্বোদর গজানন, গণেশ ঠাকুরের মূষিক তাঁর স্থূল দেহের আড়ালে লুকিয়ে থাকত। কিন্তু কার্তিকের পেখমধরা ময়ূরের যে বাহার তা আর কহতব্য নয়। কার্তিক ঠাকুরের অপূর্ব সাজসজ্জা, তাঁহার গুম্ফজোড়া, আকৃতি, বেশভূষা, ফিনফিনে শান্তিপুরে ধুতি দেখে মনে হত যেন এক বাঙালিবাবু ময়ূরের উপর এসে অধিষ্ঠান করছেন। মহিষাসুর বেচারার অবস্থা বড় শোচনীয়, সিংহের কামড়ে তার দক্ষিণহস্ত অসাড়, এদিকে আবার সিংহবাহিনী দশভুজার বর্শাবিদ্ধ হওয়ায় তার আর নড়ন চড়ন নেই, এ সত্ত্বেও তার মুখে মিল্টনের শয়তান সদৃশ কেমন একটা অদম্য বীরত্ব ফুটে বেরুচ্ছে।''

ঠাকুরবাড়ির দুর্গাপুজোর বর্ণনা দিতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, ''সবুজ কিংখাবের থান, তার ওপর সোনালি বুটি — সেটাই ছিল সকলের পছন্দ। সেই কাপড়ে সবারই চাপকান এবং টুপি তৈরি হত। এর পর আসত আতর বিক্রেতা এবং তার কাছ থেকে ছোটোরা বিনামূল্যে ছোট্ট এক শিশি আতর পেতেন এবং এভাবেই জমে উঠত ঠাকুরবাড়ির পুজো। শিশুদের মতোই আনন্দে মেতে উঠতেন বাড়ির মেয়েরা। তাঁরা প্রতিমা গড়া দেখতে যেতেন না, কিন্তু তাঁদের মহলে ভিড় করে আসত তাঁতিনীরা। তারা নিয়ে আসত শাড়ির পশরা — নীলাম্বরী, গঙ্গাযমুনা, চাঁদের আলো, কল্কা পাড়, কোকিল পাড়, সিঁথের সিন্দূর প্রভৃতি নানারকম শাড়ি।''

তখনকার দিনে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির মেয়েরাও পুজোয় সানন্দে যোগ দিতেন এবং প্রতিমার সামনে অঞ্জলি দিয়ে তবেই জলগ্রহণ করতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বড়ো মেয়ে সৌদামিনীর ভাষায়, ''পিতামহের আমলে পূজার সময় বৎসরে বৎসরে ছেলেমেয়ে ও বধূরা খুব দামি দামি জরি দেওয়া পোশাক পাইতেন। দুই তিন মাস আগে হইতে বাড়িতে দর্জি

কাজ করিতে বসিয়া যাইত। প্রত্যেক ছেলের জরির টুপি, একটি সুট, চাপকান, ইজার ও একখানি রেশমি রুমাল প্রতি বৎসর বরাদ্দ ছিল।" অন্যদিকে প্রতিমাদেবী লিখেছেন, "প্রতিটি উৎসবে ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের স্বতন্ত্র সাজ ছিল। প্রধান তিনটি উৎসব হল বসন্ত-পঞ্চমী, দুর্গোৎসব ও দোল। দুর্গোৎসবের সাজ ছিল রঙ বেরঙের উজ্জ্বল শাড়ি, ফুলের গয়না, চন্দন ও ফুলের প্রসাধন।" অবশ্য ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা দিনের বেলায় সোনার গয়না ও রাতে হীরে জহরতের জড়োয়া গয়না পরতেন। তাছাড়া পুজোর সময় ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা পেতেন এক শিশি সেন্ট বা সুগন্ধি, রুপোর ফুল, মাথা ঘষা, চিরুনি, কাঁচের চুড়ি আর নতুন বই।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ দুর্গাপুজোর সময় ইচ্ছে করেই প্রবাসে কাটাতেন। মহর্ষি-কন্যা সৌদামিনী দেবী এ-প্রসঙ্গে লিখেছেন, "পুজোর সময় কোনও মতেই পিতা বাড়ি থাকিতেন না — এইজন্য পুজোর উৎসবে যাত্রা গান আমোদ যত কিছু হইত তাহাতে আর সকলেই মাতিয়া থাকিতেন কিন্তু মা তাহার মধ্যে কিছুতে যোগ দিতে পারিতেন না।"

"ষষ্ঠীর দিন সবাইকে জিনিসপত্র 'বিলি' করে দেওয়া হত। শুধু ছেলেমেয়েরাই নয়, আত্মীয় স্বজন, কর্মচারী, ভৃত্য এবং ঝিয়েরাও নতুন জামাকাপড় পেতেন। এর পরে আসত পার্বণীর পালা। ....দ্বারকানাথ অত্যন্ত দরাজ ছিলেন এবং প্রচুর খরচ করতেন। এ সময়েই মোয়া ক্ষীর প্রভৃতি মিশিয়ে একটি বৃহদাকার মেঠাই পুজোর সময় তৈরি করা হত এবং ফুটবলসদৃশ এই-বিশাল মেঠাইয়ের স্মৃতি অনেকের মন থেকেই মিলিয়ে যায়নি।"

রবীন্দ্রনাথের মেজদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেকালের ঠাকুরবাড়ির দুর্গোৎসব প্রসঙ্গে জানিয়েছেন যে, "দালানে গিয়ে সন্ধ্যার আরতি দেখতুম, তাতে ধূপধুনা বাদ্যধ্বনির মধ্যে আমরা ঠাকুরকে প্রণাম করে আসতুম, এত বাহ্য আড়ম্বরের মধ্যে এই যা ভিতরকার আধ্যাত্মিক জিনিস।"

বিজয়ার দিন প্রতিমা নিরঞ্জনের মিছিলে ঠাকুরবাড়ির ছেলেরা যোগ দিতেন। মহর্ষি-কন্যা সৌদামিনী দেবী জানিয়েছেন, "আমাদের বাড়িতে যখন দুর্গোৎসব ছিল ছেলেরা বিজয়ার দিনে নতুন পোশাক পরিয়া প্রতিমার সঙ্গে সঙ্গে চলিত — আমরা মেয়েরা সেইদিন তেতালার ছাদে উঠিয়া প্রতিমা বিসর্জন দেখিতাম। তখন বৎসরের মধ্যে সেই একদিন আমরা তেতলার ছাদে উঠিবার স্বাধীনতা পাইতাম।" এর জন্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পিসতুতো ভাই চন্দ্রমোহন একবার মহর্ষিকে অভিযোগ করে বলেন, "দেখ দেবেন্দ্র, তোমার বাড়ির মেয়েরা বাহিরের খোলা ছাদে বেড়ায়। আমরা দেখিতে পাই, আমাদের লজ্জা করে। তুমি শাসন করিয়া দাও না কেন?" দেবেন্দ্রনাথ কিন্তু এ ব্যাপারে বাড়ির মেয়েদের কিছু বলা ঠিক বলে মনে করেন নি। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে "বিজয়ার রাত্রে শান্তিজল সিঞ্চন ও ছোটোবড়ো সকলের মধ্যে সদ্ভাবে কোলাকুলি" খুব প্রিয় ছিল। এ ছাড়াও সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন, "বিজয়ার দিন প্রত্যুষে আমাদের গৃহগায়ক বিষ্ণু আগমনী ও বিজয়ার গান করতে আসতেন।" অন্যদিকে অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "এরপরে বিজয়া। সেইটে ছিল আমাদের খুব আনন্দের দিন। সকাল থেকে খালি কোলাকুলি আর পেন্নাম। আমরা তখন যাকে তাকে পেন্নাম করছি। সেদিনও কিছু কিছু পার্বণী মিলত। আমাদের বুড়োবুড়ো কর্মচারী যাঁরা ছিলেন — যোগেশদাদা প্রভৃতিকে আমরা পেন্নাম করে কোলাকুলি করতুম। বুড়ো বুড়ো চাকররাও সব এসে আমাদের টিপটিপ করে পেন্নাম করত। তখন কিন্তু ভারি লজ্জা হত। খুশিও যে হতুম না তা নয়। কর্তামশায়কে,

কর্তাদিদিমাকে এ বাড়ির ও বাড়ির সকলেই প্রণাম করতে যেতুম। বরাবরই আমরা বড়ো হয়েও কর্তামশায়কে প্রতিবছর প্রণাম করতে যেতুম। তিনি জড়িয়ে ধরে বলতেন, 'আজ বুঝি বিজয়া'।" পরবর্তীকালে নিজেদের বাড়িতে অনুষ্ঠিত 'বিজয়া সম্মিলনী' প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "বসত মস্ত জলসা। খাওয়া দাওয়া, মিষ্টিমুখ, আতর পান, গোলাপজলের ছড়াছড়ি। ঝাড়বাতি জ্বলছে। বিষ্টু ওস্তাদ তানপুরা নিয়ে গানে গানে মাত করে দিতেন।"

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির মা দুর্গাকে খাঁটি সোনার গয়না দিয়ে সাজানো হত এবং সালংকারা সেই প্রতিমাই বিসর্জন দেওয়া হত। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিকথায় পাচ্ছি, "............ভাসানের সময়েও সে গহনা খুলিয়া লওয়া হইত না — সম্ভবত ভাসানের নৌকার দাঁড়ি মাঝি বা অন্য কর্মচারীরা তাহা খুলিয়া লইত; কিন্তু প্রতিমার গা-সাজানো গহনা আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া বাড়িতে উঠিত না।" তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হবার দশ বছর পরেও ঠাকুরবাড়িতে দুর্গাপুজো আর জগদ্ধাত্রী পুজো অনুষ্ঠিত হত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথের মতে, "দুর্গোৎসব আমাদের সমাজ-বন্ধন, বন্ধু-মিলন ও সকলের সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপনের একটি উৎকৃষ্ট ও প্রশস্ত উপায়। ইহার উপরে হস্তক্ষেপ করা উচিত হয় না; করিলে সকলের মনে আঘাত লাগিবে।" রবীন্দ্রনাথের কাছে বোধহয় নিজের ছোটোকাকার এই ধারণাই বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছিল।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তখন আদি ব্রাহ্মসমাজের ভার নিয়েছেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে অব্রাহ্মণ বসা নিয়ে একটি আলোচনার সূত্রে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে ১৯১১ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর অর্থাৎ বাংলার ১৩১৮ সালের ২৯শে ভাদ্র একটি চিঠিতে লিখেছেন, "যদি আদি সমাজে ব্রাহ্মণপূজাই চালাতে চান তবে তেত্রিশ কোটি কি অপরাধ করল? —কে আমার নাম করে বলো পুতুলপূজা তেমন দোষের নয় কারণ তাকে Symbol বলে গণ্য করা যায়, কিন্তু ব্রাহ্মণকে অন্যান্য সকল মানুষের চেয়ে পূজ্য বলে গণ্য করা ঈশ্বরের নিকট যথার্থ পাপ — কারণ তাতে অন্যান্য মানবকে অপমান করা হয়, এই পাপ আমি আদি সমাজে কিছুতেই রাখতে দেব না।" বলা বাহুল্য, চিঠিখানি এই কারণে বিশেষ মূল্যবান, কারণ এর মধ্যে দিয়ে সমাজবিপ্লবী রবীন্দ্রনাথের বজ্রগম্ভীর বাণী আমাদের সচেতন করে তোলে।

নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে লেখা একটি চিঠির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর দুর্গা প্রতিমা দর্শনের অভিব্যক্তি উপস্থিত করেছেন। এ চিঠিটি রবীন্দ্রনাথ ১৮৯৪ সালের ৫ই অক্টোবর কলকাতা থেকে লেখেন। ভাইঝিকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "কাল সমস্ত বৃষ্টি বাদলা শেষ হয়ে গেছে। আজ সকালে সুন্দর রোদ্দুর উঠেছে। আজ সকালের বাতাসের মধ্যে অতি ঈষৎ শীতের সঞ্চার হয়েছে, একটুখানি যেন শিউরে ওঠার মতো। কাল দুর্গাপূজা আরম্ভ হবে, আজ তার সুন্দর সূচনা হয়েছে। ঘরে ঘরে সমস্ত দেশের লোকের মনে যখন একটা আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত হচ্ছে তখন তাদের সঙ্গে সামাজিক বিচ্ছেদ থাকা সত্ত্বেও সে আনন্দ মনকে স্পর্শ করে। পরশুদিন সু (রেশ) স (মাজপতি) র বাড়ি যাবার সময় দেখছিলুম রাস্তার দুধারে প্রায় বড়ো বড়ো বাড়ির দালান মাত্রেই দুর্গার দশ-হাত-তোলা প্রতিমা তৈরি